বহু শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, আমাদের দেশে পাঠক্রমের একটা বড় ত্রুটি হল যে এই পাঠক্রমে সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা কৃষ্টিমূলক বিকাশ সাধনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ ভারতবাসী তাদের জীবনযাত্রায় ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন। তারা মনে করেন ধর্মই একটি প্রেরণা বা শক্তি যা চরিত্র এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন বা জাতীয় জীবনের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য কোঠারী কমিশনও শিক্ষার সার্বিক উন্নতিতে এই সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য পাঠক্রমটিও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত উপাদান পাঠক্রম ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে, সেগুলিকে পাঠক্রমের নির্ধারক বলা হয়। এ জাতীয় অসংখ্য নির্ধারক থাকলেও আমরা বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা নির্ধারক সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই তিনটি হল — কৃষ্টি (Culture), জ্ঞান (Knowledge) এবং চাহিদা বা প্রয়োজন (Need)।

কৃষ্টিমূলক নির্ধারক (Culture based Determinants) ঃ— মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা বাস করতে পারে না বলেই নিজের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে। সমাজ বলতে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টি বোঝায় না। সমাজ হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সঙ্গে বহু ব্যক্তির একটি সচেতন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিমূলক সম্পর্ক। কিন্তু সমাজ স্থিতিশীল নয় — একটি গতিশীল ধারা। প্রত্যেক সমাজের একটি মৌলিক কাঠামো থাকলেও তার শাখাপ্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত। সমাজের ধারা এগিয়ে চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিচিত্র লীলাখেলার মাধ্যমে। মানুষের জীবনধারা, সামাজিক রীতি নীতি, আদর্শ ও ভাবধারা এবং সংস্কৃতি এই সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। মানুষ বহু বিচিত্র বিষয় বা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের চেষ্টা করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরী হয় সামাজিক আদর্শ, রীতি নীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি কৃষ্টি। ব্যক্তির পরিবর্তন হয় কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি চিরন্তনভাবে চলতে থাকে। এ চিরস্থায়ী ও সজীব। শিক্ষার মাধ্যমে এটি সংরক্ষিত ও বর্ধিত হয় বলে সামাজিক কৃষ্টি পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

শিক্ষার কাজ শুধু কৃষ্টিমূলক সংরক্ষণই নয়, তাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করাও শিক্ষার প্রধান কাজ। বিভিন্ন যুগে মানুষ সভ্যতার যে রূপরেখা তৈরী করেছে, সভ্যতার অগ্রগতির

Scanned by CamScanner

সঙ্গে সঙ্গে তা আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। আদিম যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আধুনিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাছাড়া আধুনিক সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতার অনেক ভুল ত্রুটি, ভুল ধারণা, ভুল সংস্কার সংশোধন করে তাকে একটি পরিমার্জিত রূপ দিয়েছে। কৃষ্টি বা Culture কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যদিও সম্ভব নয় তবুও কৃষ্টির সঙ্গে সামাজিক রীতি নীতি, আচার আচরণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, লোকসংস্কৃতি, উৎসব ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত। এগুলির মাধ্যমে আমরা সমাজের মৌলিক কাঠামোটির সঙ্গে পরিচিত হই। শিক্ষার কাজ হল — এগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পরিমার্জনার মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করা। কৃষ্টির সঞ্চিত ভাণ্ডার তো একটি আছেই। কিন্তু তার সঙ্গে নতুন উপাদান যোগ না করলে সমাজ তো স্থবির ও জড় হয়ে যাবে, তার অগ্রগতি সম্ভব হবে না। পাঠক্রমে বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হবে। অতীত সাহিত্য বা প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, বিভিন্ন সামাজিক আচরণ, সামাজিক উৎসব ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। এগুলি পাঠ করে শিক্ষার্থী সমাজের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই সমাজের সদস্য হিসাবে ঐ গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বলে নিজেকে মনে করে গর্ববোধ করে এবং সমাজের অগ্রগতিতে সচেষ্ট হয়। সমাজের প্রবীণেরা কালের অমোঘ নিয়মে একদিন বিদায় নিতে বাধ্য হয় ঠিকই, কিন্তু তার আগে তারা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং নিজেরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তা নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যায়। পরবর্তী প্রবীণরা তাদের ঐতিহ্য ও জ্ঞান আগামী দিনের নবীন বংশধরদের হাতে তুলে দেয়। এইভাবে বংশপরম্পরায় সামাজিক রীতি নীতি, ভাবধারা, আদর্শ, সংস্কার সবকিছু সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত হয়ে যায়। পাঠক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পরিবহণে সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া সামাজিক গোষ্ঠী বা Social Group তৈরী করার ক্ষেত্রেও পাঠক্রম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক। তাছাড়া ইতিহাস ও ভূগোলও জনসমষ্টি গঠনের পটভূমিটি বিশ্লেষণ করে। তাই পাঠক্রমে এ সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠক্রমের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির যেমন সংরক্ষণ করি, তেমনই সেগুলি সমৃদ্ধ করি এবং সেগুলির পরিবহণের চেষ্টাও করি। সমাজের অস্তিত্বের জন্য পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, রীতি নীতি, ভাবধারা ও আদর্শের সঙ্গে যোগসূত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, সভা-সমিতি, বিতর্ক সভা, আলাপ-আলোচনা, ভাববিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে নবীনেরা প্রবীণদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়। সমাজের ধারাবাহিকতা শিক্ষার মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত, সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা তো আমরা আজও ভুলতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা অতীত ও বর্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির একটা যোগসূত্র স্থাপন করে এবং পাঠক্রম হল তার প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

Scanned by CamScanner

শিক্ষার আর একটি কাজ হল বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বিভিন্ন সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন সমাজে এগুলি বিভিন্নভাবে পালিত হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যখন কোন প্রয়োজনে এক স্থানে মিলিত হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি সম্মিলিত হয়ে একটি নতুন সামাজিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এটিকে কৃষ্টিমূলক সমন্বয় বলা হয়। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একটা একাত্মতাবোধ অনুভব করতে পারে। আজ বাঙালীরা বিহার, আসাম, উড়িষ্যা বা অন্য কোন রাজ্যের কৃষ্টিমূলক নানা দিকের সঙ্গে পরিচিত, তারাও আমাদের কৃষ্টির অংশীদার। এর ফলে জাতীয় সংহতি দৃঢ় হতে পেরেছে। তেমনই কোন কলকারখানা, চা-বাগান কিংবা সরকারী আবাসনে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক পার্থক্য ভুলে গিয়ে সকলে মিলেমিশে একটি যৌথ কৃষ্টি সৃষ্টি করে। শিক্ষা এই সমন্বয়ের কাজটি আরও ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন করে থাকেন ঠিকই, কিন্তু এই মিশ্র কৃষ্টিটি বিভিন্ন সমাজের মানুষকে একত্রিত করে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্টি বা সংস্কৃতির ভূমিকা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। সামাজিক পরিবর্তনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সংস্কৃতি। প্রতি মানবসমাজে একটি বিশেষ জাতীয় সংস্কৃতি বর্তমান। মানবসমাজ পরিচিত হয় তার সংস্কৃতির মাধ্যমেই। সংস্কৃতি গঠিত হয় বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায়, যেমন — সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, ন্যায়নীতিবোধ, প্রথা ইত্যাদি। যত সময় অতিবাহিত হয় ততই এগুলির পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে সমাজের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এই সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন সমাজের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশেও প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সমাজের সংগঠন ও ব্যবস্থার মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য আছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলে সমাজ জীবনেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংস্কৃতিই সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। তাছাড়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে তার ফলেও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও এইসব আবিষ্কার একটা পরিবর্তন এনেছে। আবার দেখা গেছে কোন কোন ধর্মীয় আন্দোলনও সমাজজীবন ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত করেছে। শ্রীচৈতন্যদেব, রামমোহন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা বাংলার সমাজজীবনে যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেইজন্য সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পাঠক্রমে এই দিকটি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কাজেই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণে কৃষ্টিমূলক উপাদান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জ্ঞানমূলক নির্ধারক (Knowledge based Determinants) ঃ— শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের ভিত্তিতে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। পাঠক্রম

Scanned by CamScanner

যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি উপায়, সেইজন্য পাঠক্রম নির্ধারণে জ্ঞানমূলক উপাদান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞানের ফলেই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞান অর্জনের ফলেই সভ্যতা এগিয়ে চলে। শিক্ষাই মানুষের মনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে দেয় এবং তার চেতনার উন্মেষ সাধন করে। কিন্তু জ্ঞান অর্জন করাই শিক্ষার একমাত্র বা চরম লক্ষ্য নয়। এটি একটি উপায়মাত্র। কিন্তু বর্তমানে আমরা পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের দিকেই বেশি জোর দিয়েছি এবং ঐ জ্ঞান আহরণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে একটি প্রশংসাপত্র অর্জন করাকেই শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য করে রেখেছি। যে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারছি না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে 'অসন্তোষের কারণ' রচনাংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে — শিক্ষাকে আমরা বহন করেই চলেছি কিন্তু কোন দিন শিক্ষাকে আমাদের বাহন করতে পারলাম না।

এর ফলও হচ্ছে মারাত্মক। শিক্ষাব্যবস্থা তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উপর আমাদের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান তো নির্দিষ্ট নয় এবং এর একটিমাত্র রূপও নেই। জ্ঞানের বিভিন্ন দিক আছে। জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে করতে আমরা এখন যেন চরম সীমায় পৌঁছে গেছি। তাছাড়া সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য একই জাতীয় জ্ঞান অর্জন করা উচিতও নয় — সম্ভবও নয়। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে কোন্ ধরনের জ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজন ও উপকারী এবং কোন্ শিক্ষার্থীর জন্য কি ধরনের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া প্রকৃত জ্ঞান বিতরণের বস্তু নয় এবং বাইরের থেকে জ্ঞান শিক্ষার্থীর মগজে প্রবিষ্ট করানো সম্ভবও নয়। ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তার সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করে — তাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। সেইজন্য বলা যায় জ্ঞান অর্জন করা একটি উপায় মাত্র — লক্ষ্য কিছুতেই হতে পারে না।

জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে তিনটি উপাদান যুক্ত হয়ে আছে — প্রত্যক্ষণ (Perception), ধারণা অর্জন (Conception) এবং সংযোগমূলক শিখন (Associative Learning)। কোন বিশেষ মুহূর্তে যে সমস্ত ঘটনাবলী বা বস্তু কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, সেই ঘটনা বা বস্তু সম্বন্ধে বিশেষধর্মী জ্ঞান অর্জনকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ। কোন বস্তু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা প্রথমে তার সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক সংবেদন অর্জন করি। এরপর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ বস্তুটির সঙ্গে একটা অর্থ যুক্ত করি। এটিকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ এবং এর ফলে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে বলে প্রত্যক্ষণমূলক জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষণ হল জ্ঞান অর্জনের প্রথম সোপান।

এরপর ঐ বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা অর্জিত হয়। এই ধারণাটি পরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান থেকে অর্জিত হয় এবং এটি সাধারণধর্মী। প্রত্যক্ষণের সঙ্গে একটি বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা যুক্ত থাকে ; কিন্তু ধারণাটি সাধারণধর্মী ও সার্বজনীন।

Scanned by CamScanner

সংযোগমূলক শিখন স্মরণ-এর উপর – বিশেষত মনে করা ও চিনতে পারার উপর নির্ভরশীল। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান লব্ধ অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপিত হয়। এইভাবে একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য একটি অভিজ্ঞতার, তার সঙ্গে আর একটির – এইভাবে সংযোগের একটি বড় শিকল তৈরী হয়ে যায়। এই জাতীয় শিখন অন্যান্য শিখনকেও সাহায্য করে।

অনেক শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানকে সাধারণ এবং বিশেষধর্মী বা বৃত্তিমূলক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা হল সাধারণ শিক্ষা (General)। পাঠক্রমে এই সাধারণ শিক্ষার জন্য একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষার্থীকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। এই ক্ষেত্রগুলি হল – বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, কর্ম অভিজ্ঞতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন। এছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণের আগে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য একই রকম সাধারণ ও সার্বজনীন বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সাধারণধর্মী শিক্ষার একটা বিরাট পার্থক্য যেন না থাকে। বর্তমান পাঠক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই উপাদানটির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

প্রয়োজন বা চাহিদা ভিত্তিক নির্ধারক (Need based Determinants) ঃ– শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে। এই চাহিদা দুটি দিক থেকে বিচার করতে হবে – শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সমাজের চাহিদা। এই চাহিদা আবার নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাবের উপর। শিক্ষা সম্বন্ধে বা জ্ঞানের বিশেষ দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থী বা সমাজের মনোভাব অনুযায়ী শিক্ষার্থী জ্ঞানের একটি বিশেষ দিক নির্বাচন করে নেয়। অভিভাবকেরা শিশুর শিক্ষার জন্য প্রচুর ব্যয় করেন। তারা চাইবেন এই ব্যয় যেন সার্থক হয়। শিক্ষা যেন শিশুর, তার নিজের এবং সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। একটা সময়ে আমাদের দেশে প্রচুর চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তখন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং বহু অভিভাবক ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞান শাখার পাঠক্রম অনুসরণ করতে প্ররোচিত করতেন। আবার দেশে কৃষি বিপ্লবের সময় পাঠক্রমে কৃষিবিজ্ঞান গুরুত্ব পেয়েছিল। আসল কথা হল – পাঠক্রম যেন সমাজের বাস্তব প্রয়োজনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামাজিক চাহিদা ছাড়াও শিক্ষার্থীর নিজস্ব কতকগুলি চাহিদা আছে। বয়ঃসন্ধিকালে এই চাহিদাগুলি প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে। আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, প্রাক্ষোভিক চাহিদা, দলবদ্ধতার চাহিদা, সৃজনমূলক কর্মের চাহিদা, অবকাশ যাপনের চাহিদা, খেলাধূলার চাহিদা, সহপাঠক্রমিক শিক্ষার চাহিদা, সহ-শিক্ষামূলক চাহিদা (co-education), যৌনশিক্ষার চাহিদা (sex-education) ইত্যাদি নানা ধরনের চাহিদা শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্ত চাহিদা পূর্ণ না হলে শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি (maladjustment) দেখা দেয়। এর জন্য পাঠক্রমে বিষয়বস্তুর পাশাপাশি নানারকম কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেইজন্য বর্তমানে নানাপ্রকার সহপাঠক্রমিক কার্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অনেক অভিভাবক তাঁদের স্কুল বা কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে কোন্ কোন্ বিষয় তাদের কর্মজীবনে সহায়তা করেছে আর কোন্‌গুলি বাধা দিয়েছে – সেইমত বিষয়বস্তুর গ্রহণ ও বর্জন চান। অনেক শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক শৃঙ্খলার (faculty) সম্পর্ক আছে ধরে নিয়ে প্রয়োজন থাক আর না থাক, কতকগুলি বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি। এগুলি যে সবসময় শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয়, তা নয়। কিন্তু শিক্ষার্থী বিরক্তির সঙ্গে ঐ বিষয়গুলি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি যে কতখানি উপলব্ধ হয় তাও বোঝা যায় না। আবার অনেক সময় কতকগুলি ভ্রান্ত বা অলীক ধারণা থেকে শিশু তার চাহিদা তৈরী করে নেয়। সকলের ধারণা, সিনেমা অভিনেতা বা ডাক্তারদের আয় আকাশচুম্বী। ফলে তাদের মধ্যে ঐ সমস্ত বৃত্তি গ্রহণ করার একটা চাহিদা লক্ষ্য করা যায় এবং সে চায় পাঠক্রম তাকে সেইভাবে তৈরী করুক। একথা সত্য যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুর সঠিক চাহিদার পরিচয় পাওয়া যায় না। এটা বয়স ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য পাঠক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে একাদশ শ্রেণী থেকে চাহিদা ভিত্তিক বিশেষধর্মী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাঠক্রম রচনায় শিশুর চাহিদা বিশেষভাবে কার্যকরী।

Scanned by CamScanner